গ্রামীণ রাজস্বব্যবস্থা ঃ

সুলতানি সাম্রাজ্য ছিল চরিত্রগতভাবে একটি 'যুক্তরাষ্ট্র'। নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহ দ্বারা যেমন এই সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল ; তেমনি এই রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও নির্ভরশীলতা ছিল মূলত যুদ্ধজয়ের ওপরেই। এই সরকারের প্রয়োজন ছিল এক বিশাল সেনাবাহিনীর। বলা বাহুল্য, এই বাহিনীর ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজন ছিল প্রচুর অর্থের। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল সুলতান ও অভিজাতদের ব্যক্তিগত বিলাসব্যসন। শাসকশ্রেণির ছোটো-বড়ো সকল সদস্যই পারসিক আদব-কায়দা অনুকরণ করতে আগ্রহী ছিলেন। সুদৃশ্য ও বিশালাকার রাজপ্রসাদ, দরবারের জাঁকজমকপূর্ণ কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য প্রয়োজন ছিল বিপুল অর্থের। অভিজাতদের ব্যক্তিগত বিলাসী জীবন পরিচালনার জন্যও প্রয়োজন ছিল প্রভূত অর্থের। কিন্তু দেশের আয়ের উৎস ছিল সীমাবদ্ধ। শিল্প-উৎপাদন বা ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে আয় হত কিঞ্চিৎ। স্বভাবতই প্রত্যেকেই অর্থের জন্য তাকিয়ে থাকতেন সেই গ্রামীণ কৃষকদের দিকে। এক কথায়, সুলতানি

১. *আশরাফ—হিন্দুস্তানের জনজীবন ও জীবনচর্চা (১৯৯৪), পৃ. ১২৭।*

আমলে গোটা সমাজের প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান দিতে হত কৃষকদের। ভূমিরাজস্ব হিসেবে সুলতান ও অন্যান্য অন্তর্বর্তীশ্রেণি এই অর্থ চূড়ান্ত নিপীড়নের মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে আদায় করতেন। ভারতে তুর্কিদের অনুপ্রবেশের আগে শাসকশ্রেণি কৃষি-উৎপাদনের কতটা সংগ্রহ করতেন কিংবা জমিদারি কর হিসেবে উৎপাদক কিছু প্রদান করতে বাধ্য ছিলেন কিনা, সে বিষয়ে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। সমকালীন 'লেখমালা' থেকে নানা ধরনের করের নাম জানা যায়। কিন্তু তাদের প্রকৃতি বা পরিমাণ কী ছিল, সে বিষয়ে লেখগুলির বক্তব্য আদৌ স্পষ্ট নয়। ভারতে তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই সম্ভবত করব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। সুলতানেরা মোটামুটিভাবে পুরোনো ব্যবস্থাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। উৎপাদকদের কাছ থেকে এককালীন উপঢৌকন শাসকশ্রেণি গ্রহণ করতেন। তবে অনেক অঞ্চলই শাসকদের রাজস্ব দিতে অস্বীকৃত হত। এই সকল বিদ্রোহী এলাকায় অভিযান চালিয়ে সরকারি ফৌজ খাদ্যশস্য, গবাদিপশু, দাস-দাসী ইত্যাদি লুঠ করে নিয়ে আসত। বলা বাহুল্য, এই ব্যবস্থায় সুলতানি শাসনের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় ছিল না। গিয়াসউদ্দিন বলবনের আমলে (১২৬৬-'৮৬ খ্রিঃ) দিল্লির অভিজাতরা প্রায়ই সুলতানি বণিকদের কাছে ঋণ নিয়ে অর্থাভাব মেটাতে বাধ্য হতেন। আলাউদ্দিন খলজির আমলে (১২৯৬-১৩১৬ খ্রিঃ) এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে।

সুলতানি আমলে মোটামুটি চারশ্রেণির জমি ছিল—খালিসা, ইকতা, অধীনস্থ জমি এবং ওয়াকফ সম্পত্তি। খালিসা-জমি সুলতান ইচ্ছামতো বন্দোবস্ত দিতেন। রায়তওয়ারী ব্যবস্থার মতো এক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীরা সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে জমির কর আদায় করতেন। পরগনায় *'অমিল'* এবং গ্রামে *'পাটোয়ারী'*, *'চৌধুরী'*, *'মুকদ্দম'* নামক কর্মচারী এই রাজস্ব আদায় করতেন। 'ইক্‌তা' ছিল একধরনের সামরিক-প্রশাসনিক বিভাগ। এই বিভাগের অধিকর্তা অর্থাৎ ইক্‌তাদার বা মাক্‌তি (বা মুক্‌তি) সুলতান কর্তৃক নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের রাজস্ব আদায় করতেন এবং ইক্‌তার প্রশাসনিক খরচ বাদে উদ্‌বৃত্ত অর্থ কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা দিতেন। 'খাজা' নামক কেন্দ্রীয় কর্মচারী ইক্‌তাদারের রাজস্ব-বিষয়ক কাজ পরিদর্শন করতেন। তৃতীয় শ্রেণির সম্পত্তি ছিল হিন্দু জমিদারদের হাতে, যাঁরা আগে থেকেই এই সকল জমি চাষ-আবাদের অধিকার ভোগ করছিলেন। এঁরা সুলতানকে বাৎসরিক নির্দিষ্ট রাজস্ব প্রদানের শর্তে পূর্ব-অধিকার বজায় রাখতে পেরেছিলেন। *'ওয়াকফ্'* বা *'ইনাম'* ছিল নিষ্কর সম্পত্তি। সুলতান মুসলিম ধর্মজ্ঞানী, পণ্ডিত ও সন্তদের সেবায় এই জমি দান করতেন। তবে আলাউদ্দিন খলজি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে ওয়াকফ্ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে রাজস্বের বিনিময়ে বন্দোবস্ত দেন। তিনি খুৎ, চৌধুরী, মুকদ্দম প্রমুখ গ্রামীণ রাজস্ব আদায়কারী কর্মীগোষ্ঠীর ওপরেও কর আরোপ করেন। ইতিপূর্বে এই মধ্যস্বত্বভোগী-গোষ্ঠী কৃষকদের শোষণ করে বহু রাজস্ব আত্মসাৎ করতেন ; কিন্তু কোনোরকম কর দিতেন না।

সাধারণভাবে সরকারি আয়ের উৎস ছিল ইক্‌তার উদ্‌বৃত্ত অর্থ। মুক্‌তি বা ইক্‌তাদার তাঁর ইক্‌তার ভূমিরাজস্ব আদায় করে এবং ইক্‌তার প্রশাসনিক ও সামরিক ব্যয়নির্বাহের পর উদ্‌বৃত্ত রাজস্ব দিল্লির রাজকোষে জমা দিতে বাধ্য থাকতেন। এই ভূমিরাজস্বের নাম ছিল *'খারাজ'* (খারাজ-ই-জিজিয়া)। ইক্‌তার খারাজ ও অন্যান্য কর আদায় করতেন ইক্তাদার। অবশিষ্ট খালিসা জমির খারাজ সরাসরি আদায় করতেন সরকারি কর্মচারীরা। আলাউদ্দিন খলজি ৫০ শতাংশ রাজস্ব ধার্য করেছিলেন এবং মহম্মদ-বিন্-তুঘলক দোয়াব প্রভৃতি উর্বর অঞ্চলে উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক রাজস্ব হিসাবে আদায় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অবশ্য মহম্মদ তুঘলক দোয়াবে শস্যহানি ও বিদ্রোহের কারণে শেষ পর্যন্ত অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করেননি। রাজস্বের হার নির্ধারণের কোনো নির্দিষ্ট বিধি ছিল না। তবে কোরানের অনুশাসন অনুসারে এই হার নির্ধারণের একটা প্রবণতা ছিল। গিয়াসউদ্দিন তুঘলক নীতিগতভাবে কোনো একটি

বছরে সর্বোচ্চ এগারো বা দশ শতাংশের বেশি রাজস্ব বৃদ্ধির বিরোধী ছিলেন। মহম্মদ তুঘলক কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে *'দিওয়ান-ই-কোহী'* নামে একটি কৃষিদপ্তর গঠন করেন। ফিরোজ-শাহ-তুঘলক কৃষকদের কৃষিঋণ 'তকাভি' পরিশোধ থেকে রেহাই দেন। তিনি আরও প্রায় চব্বিশটি সাধারণ শুল্ক মকুব করে চাষিদের বোঝা লাঘব করেন। কর নির্ধারণ করা হত শস্যে, তবে নগদ টাকায় কর দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এ বিষয়ে *বারাণীর* বক্তব্য কিছুটা পরস্পর-বিরোধী। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন যে, আলাউদ্দিনের কর্মচারীরা ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রাজস্বের জন্য এতটাই চাপ দিতেন যাতে কৃষক তার পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য হত। আবার অন্যত্র লিখেছেন যে, আলাউদ্দিনের কঠোর নির্দেশ ছিল রাজস্ব শস্যের মাধ্যমে নিতে হবে এবং তা শহরে পাঠাতে হবে। সম্ভবত, নগদ অর্থেই খাজনা নেবার প্রবণতা ছিল। আবার কৃষকদের উৎসাহিত করার জন্য এবং দিল্লির শস্যভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে শস্যে রাজস্ব নেওয়া হত।

গিয়াসউদ্দিন তুঘলক খুৎ ও মুকদ্দমদের ওপর থেকে গবাদিপশু ও চাষের ওপর থেকে কর তুলে দেন। তবে এরা কৃষকের ওপর কোনো কর আরোপ করতে পারবে না বলে স্থির হয়। কৃষকদের ওপর থেকেও বকেয়া কর মকুব করে দেন। মহম্মদ তুঘলকের সময় করের বোঝা বেশ কঠোর করা হয়। *বারাণীর* মতে, সুলতান কৃষকদের ওপর নতুন কর চাপিয়েছিলেন। কিন্তু ইয়াহিয়া-বিন্-সিরহিন্দের মতে, সুলতান খারাজ-এর সাথে নতুন করে খরাই ও চরাই আদায় করতে শুরু করেন। *সিরহিন্দের* মতে, উৎপন্ন শস্যের গড় হার ধরে মূল্যনির্ধারণের ফলে খাজনার পরিমাণ প্রকৃত মূল্যের চেয়ে বেশিই হত। এর প্রতিবাদে দিল্লি ও দোয়াব অঞ্চলে কৃষক-বিদ্রোহ শুরু হয়। অনেকেই কৃষিকার্য ছেড়ে দেয়। সুলতানের নির্দেশে শিকদার ও ফৌজদাররা গ্রামীণ কৃষিজীবীদের ওপর অকথ্য দমনপীড়ন চালান। বারাণীর বিবরণ অনুযায়ী খুৎ ও মুকদ্দম শ্রেণিও এই বিদ্রোহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তবে দুর্ভিক্ষ মোকাবিলার জন্য সুলতান কূপ খনন ও কৃষি সম্প্রসারণের জন্য কৃষকদের ঋণদানের ব্যবস্থা করেন। সুলতানি যুগে এর নাম ছিল *'সঞ্জার'*, এবং মোগল যুগে একে বলা হত *'তাকাভি'*। মহম্মদ তুঘলক ছিলেন প্রথম সুলতান যিনি এই ঋণদানের ব্যবস্থা করেন। 'দিওয়ান-ই-আমির কোহি' নামক দপ্তর এই কাজের দায়িত্ব পায়।

বারাণীর মতে, সুলতানের সাহায্যদান প্রকল্প সফল হয়নি। সম্ভবত, সরকারি সুবিধা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে পৌঁছাতে পারেনি। তাই ফিরোজ তুলঘক খরাই, চরাই-সহ প্রায় চব্বিশ প্রকার আবওয়াব তুলে দেন। তবে তিনি হিন্দুদের ওপর 'জিজিয়া কর' চালু করেন। ফিরোজের পরবর্তীকালে কৃষি-কর সম্পর্কে খুব কম তথ্য পাওয়া যায়। সম্ভবত, এই সময় স্থানীয় শাসকেরা কর আদায় ও ভোগ করতেন।

'জাকত' হল একপ্রকার ধর্মীয় ও সেবামূলক কর, যা মূলত মুসলমানদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়। *ড. এ. বি. পাণ্ডের* মতে, *'জাকত'* তিনভাবে আদায় করা হত। যেমন—(১) সম্পদের অধিকারী ও উপার্জনশীল মুসলমানরা তাঁদের মোট আয়ের দুই থেকে আড়াই শতাংশ দরিদ্র মুসলমানদের সেবার জন্য রাষ্ট্রকে প্রদান করতেন। (২) ব্যক্তিগত জমির ভোগদখলকারীগণ উৎপন্ন শস্যের একাংশ *'আশরা'* বা ভূমি-কর হিসেবে দিতেন। চাষযোগ্য এলাকায় দশ শতাংশ এবং অ-চাষযোগ্য এলাকায় পাঁচ শতাংশ হারে *'আশরা'* আদায় করা হত। (৩) বাণিজ্যরত মুসলমানদের বাণিজ্য-আয় থেকে আড়াই শতাংশ হারে এই কর দিতে হত। এইসব কর আলাদাভাবে সংরক্ষিত করা হত এবং সদর-উস্-সুদূর-এর মাধ্যমে মুসলমানদের সেবায় ব্যয় করা হত।

অ-মুসলমানদের ওপর 'জিজিয়া' কর ধার্য করা হত। এটাও ছিল একপ্রকার ধর্ম-কর। মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অ-মুসলমানদের জীবন, সম্পত্তি ও ধর্মস্থানের নিরাপত্তার জন্য এই কর দিতে হত। এরও

কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ ছিল না। সাধারণত তিনভাবে এই কর আদায় হত। ধনী ব্যক্তিরা বার্ষিক ৪৮ দিরহাম, মধ্যবিত্তরা ২৪ দিরহাম এবং অন্যান্যরা ১২ দিরহাম 'জিজিয়া' হিসেবে প্রদান করতেন। অবশ্য অনেকেই জিজিয়া প্রদান থেকে রেহাই পেতেন। মহিলা, শিশু, ভিক্ষুক, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, সাধু-সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ এবং যাদের কোনো আয় নেই এমন লোকেদের 'জিজিয়া' দিতে হত না। অবশ্য ফিরোজ তুঘলক ব্রাহ্মণদের ওপরেও জিজিয়া আরোপ করেছিলেন। যাই হোক্, জিজিয়া থেকে খুব কম রাজস্বই আদায় হত। ড. ***রোমিলা থাপার*** মনে করেন, "*শহরে উচ্চ-আয়সম্পন্ন মানুষের ওপরেই জিজিয়া আরোপিত হত। গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের সম্ভবত এই করভার বহন করার ক্ষেত্রে কড়াকড়ি ছিল না।*"

খনিজ আয় বা যুদ্ধে লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাগ হিসেবে আদায় করা হত *'খাম্‌স'*। ইসলামী আইন অনুসারে রাষ্ট্র এক-পঞ্চমাংশ হারে খাম্‌স আদায়ের অধিকারী ছিল। যদিও সুলতানেরা এই আইন ভঙ্গ করে প্রায়শই পাঁচ ভাগের চার ভাগ রাষ্ট্রে বাজেয়াপ্ত করে নিতেন। ফিরোজ তুঘলক এক-পঞ্চমাংশ হারে 'খাম্‌স' আদায় করতেন। সিকন্দর লোদী আদৌ এই কর আদায় করতেন না।

উপরিলিখিত করসমূহ ছাড়াও সুলতানি আমলে বিভিন্ন সময়ে নানারকমের কর আদায় হত। ফিরোজ তুঘলক সেচযুক্ত এলাকায় দশ শতাংশ হারে সেচ-কর আদায় করতেন। এইভাবে আলাউদ্দিন খলজি গৃহ-কর এবং পশুচারণক্ষেত্র-কর আদায় করতেন। উত্তরাধিকারীবিহীন কোনো মুসলমানের মৃত্যুর পর তার সম্পত্তিও রাষ্ট্রের সম্পত্তি হিসেবে অধিকৃত হত। বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসক এবং অনুগত-সামন্তদের কাছ থেকে উপঢৌকন হিসেবেও কেন্দ্রীয় কোষাগারে কিছু অর্থসম্পদ জমা পড়ত।